৬ষ্ঠ সংখ্যা জুন, ২০১৮

ইল্লোড়

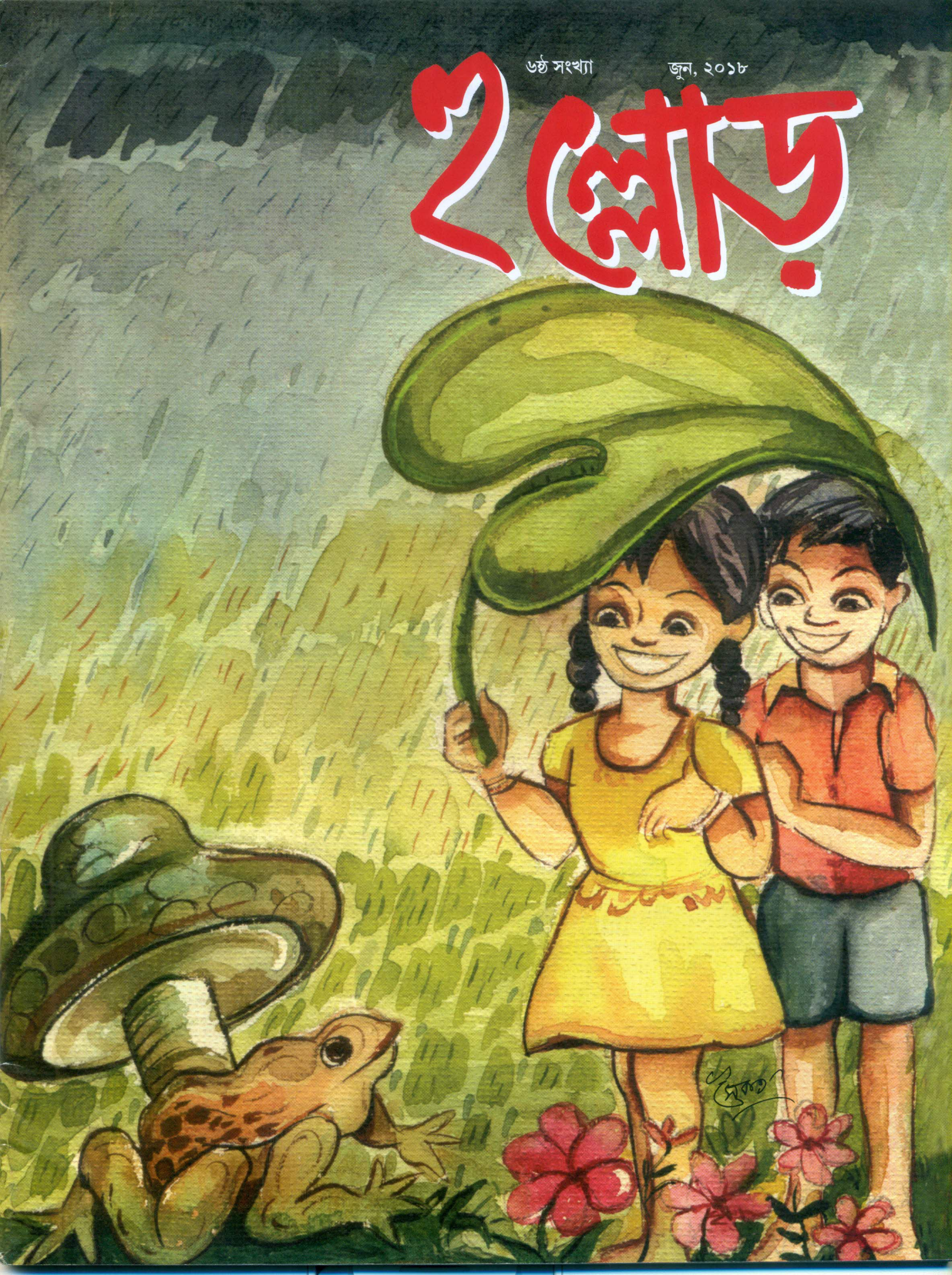

সিন্দুক

অন্ধকারের উৎস হতে

ডঃ অভিজিৎ গুহ
অধ্যাপক, আইআইটি খড়গপুর

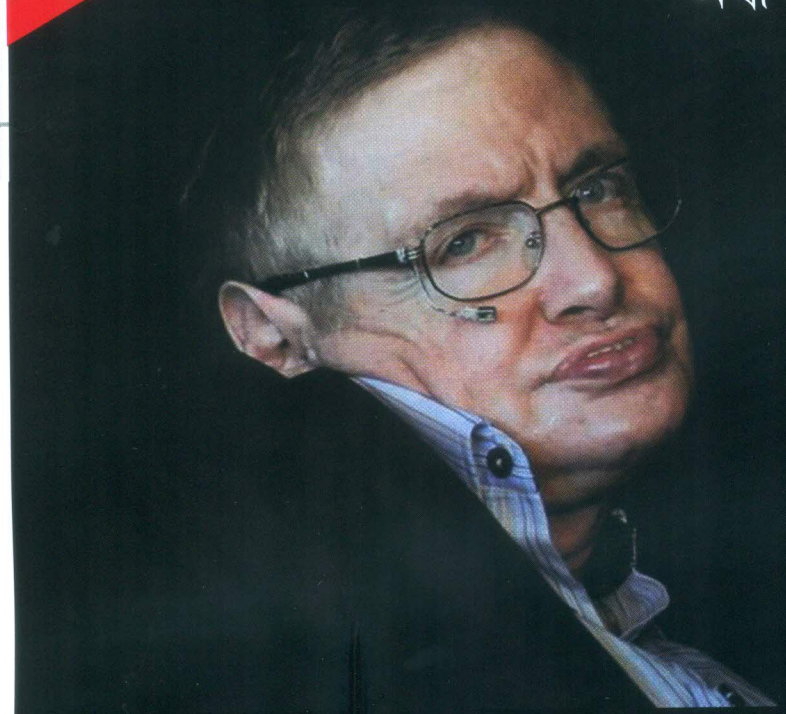

স্টিফেন হকিং
(১৯৪২-২০১৮)

রূপকথায় কত কী না ঘটে! রাজপুত্র দৈত্যদের হারিয়ে দেয়, ঘোড়ার পিঠে চেপে তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনে। আরও কত ভাল ঘটনা। যেসব ঈপ্সিত ঘটনা আমাদের নিজেদের জীবনে প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়, তাই সম্ভব হয় রূপকথার জাদুকাঠিতে। তাই সমস্ত দেশে, সমস্ত কালে রূপকথা এত জনপ্রিয়। আমি আজ এমনই এক প্রায় রূপকথার কাহিনি শোনাব, যার নায়কটি সত্যিকারের রক্তমাংসের মানুষ যাকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। স্টিফেন হকিং তাঁর নাম। তিনি দেশ-জাতি-ধর্ম-পেশা-লিঙ্গ-বয়স নির্বিশেষে সকল মানুষের জীবনকে উদ্ভাসিত করেছেন তাঁর বিজ্ঞান, চেতনা ও জীবনবোধ দিয়ে। বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর নাম আজ প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে।

অথচ তাঁকে দেখলে বোঝা যেত না এতবড় কর্মযজ্ঞ ও এত সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তাঁর পক্ষে করা সম্ভব। জীবনের বেশির ভাগ সময়টিই তাঁর দেহ বন্দী ছিল হুইলচেয়ারে। মাত্র একুশ বছর বয়সেই ধরা পড়ে তিনি এক মারণরোগে আক্রান্ত, যার নাম অ্যামিওট্রোপিক ল্যাটারাল স্ক্লেরোসিস (এএলএস), যা মোটর নিউরোন ডিজিজ নামেও পরিচিত। ডাক্তাররা বলেছিলেন এ রোগ হলে বড় জোর দু' তিন বছর রুগী বাঁচে। সম্ভবত অদম্য মানসিক শক্তির জোরে হকিং বাঁচলেন মোট ৭৬ বছর। কোনও রূপকথার লেখকেরও মনে হয় এমন ঘটনা কল্পনা করা সম্ভব হত না।

কোনও প্রতিবন্ধকতাই স্টিফেন হকিংকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি ইংল্যাণ্ডের কেম্ব্রিজ শহরে

বাস করতেন। কেম্ব্রিজের সিলভার স্ট্রিট, ওয়েস্ট রোড দিয়ে সন্ধ্যাবেলা একটি মোটরচালিত হুইলচেয়ার চলেছে মন্থর অথচ দৃপ্ত গতিতে- এ দৃশ্য কেম্ব্রিজবাসী অনেকেরই চোখে পড়েছে। এক কিংবদন্তি গবেষক একটি কর্মব্যস্ত দিন কাটিয়ে দিনান্তে ঘরে ফিরছেন। লক্ষ্যণীয়, নিঃশঙ্ক হুইলচেয়াটি রাজপথ দিয়ে চলছে, ফুটপাথ দিয়ে নয়, যদিও ইংল্যাণ্ডের প্রতিটি ফুটপাথ হুইলচেয়ার ও অন্ধ ব্যক্তিদের চলার সুবিধার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত। হুইলচেয়ারের পিছনে দৃষ্টি আকর্ষণকারী লাল আলোও নেই। এই দৃশ্যে আমি অনেক সময় 'যদি কিছু হয়'-এর অজানা ভয়ে শঙ্কিত হয়েছি। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছি রাজপথ দিয়েই যাবে এই মহামানবের রথ। স্টিফেন হকিংকে দেখে দর্শক যখন ভাবছেন হুইলচেয়ারে বন্দী এক সঞ্চালনহীন দেহ, হুইলচেয়ারের মানুষটি তখন ভাবছেন, রিচার্ড ব্র্যানসন যে হাইপারসনিক মহাকাশযানে ভ্রমণপিপাসুদের মহাকাশ ঘুরিয়ে আনার পরিকল্পনা করেছেন তাতে সওয়ারি হবেন। এই স্বপ্ন অংশত পূরণও হল ২০০৭ সালের ২৬ এপ্রিল। মহাকাশযানে নয়, আটলান্টিক মহাসাগরের ওপরে বিশেষভাবে প্রস্তুত ও সঞ্চালিত আকাশযানের গ্র্যাভিটিশূন্য পরিবেশে হকিং তাঁর হুইলচেয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একক মহিমায় শূন্যে ভেসে বেড়ালেন, মুখে তাঁর উদ্দীপ্ত হাসি। শিশুসুলভ সারল্যে তিনি বললেন, "Space, here I come" ("হে মহাশূণ্য, এই আমি এসেছি")। হুইলচেয়ারে তাঁর আত্মা কখনও বন্দী ছিল না। তাঁর দেহে মোটর নিউরোন রোগ ছিল, আত্মায় নয়। ওই দিন মহাকাশে তাঁর দেহও কিছু সময়ের জন্য স্বাধীনতা পেল হুইলচেয়ার থেকে। স্টিফেন হকিং-এর জীবন তাই আসলে এক উদযাপন, Celebration।

স্টিফেন হকিং ছিলেন একজন তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী। ফলে গবেষণাগারে গিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রয়োজন তাঁর ছিল না। কিন্তু তাত্ত্বিক গবেষণা করতে গেলেও পড়তে হবে অনেক বই, অন্য বিজ্ঞানীদের লেখা গবেষণাপত্র। করতে হবে পাতার পর পাতা জটিল দুরূহ অঙ্ক। তারপর সেইসব গাণিতিক যুক্তি ও আবিষ্কার সুন্দরভাবে গ্রথিত করে তৈরি করতে হবে নিজের গবেষণাপত্র যা প্রকাশ করতে হবে যাতে অন্য বিজ্ঞানীরা তা পড়তে পারেন। অথচ স্টিফেন হকিং তো কথা বলতে পারতেন না। নড়াচড়া করতে পারতেন না। হুইলচেয়ারে তাঁর শরীরকে যেভাবে সেট করা হত সেই ভঙ্গিতেই বসে থাকতেন তিনি। তাহলে তিনি এই বিশাল পরিমাণ গবেষণা করলেন ও প্রকাশ করলেন কীভাবে? ছিল অসীম স্বপ্ন, অদম্য আত্মবিশ্বাস ও মনের জোর। ছিল পরিবার, নার্স, ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য। ছিল কলেজের অর্থ ও অন্য সাহায্য। আর বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল টেকনোলজি।

১৯৯০-৯৫ সাল। এই পুরো সময়টা স্টিফেন হকিংকে খুব কাছের থেকে দেখেছি। তাঁর হুইলচেয়ারেই ছিল একটি কম্পিউটার, যার মনিটর চেয়ারের হাতলের ওপর বসানো। ডিজিটাল ডিকশনারি থেকে একটি একটি করে শব্দচয়ন করে তাঁকে তৈরি করতে হত এক একটি বাক্য। তারপর সেই বাক্য জুড়ে জুড়ে এক একটি প্যারাগ্রাফ। অর্থাৎ পুরো প্রক্রিয়াটির জন্য প্রয়োজন অনেক ধৈর্য ও অধ্যবসায়। স্ক্রিনের ওপর একটি Cursor স্ক্যান করত উপরনিচে ও পাশাপাশি। ঠিক শব্দটির ওপর Cursor এলে তিনি শব্দটি নির্বাচন করতেন। সফট্ওয়্যারের সাহায্যে এই নির্বাচন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা হয়েছিল পরে (আজকাল যেমন স্মার্ট ফোনে দু'একটি বর্ণ টাইপ করলেই সম্ভাব্য পূর্ণ শব্দগুলো নিজে থেকেই স্ক্রিনের ওপর আসতে থাকে—অনুরূপ পদ্ধতিতে)। আমি যে সময়কার কাহিনি লিখছি সেসময় হকিং অতি সামান্য অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে পারতেন। পরবর্তীকালে তাঁর এই ক্ষমতা স্তব্ধ হয়ে যায়। তখন কম্পিউটারের Cursor-এর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতেন ও শব্দচয়ন করে বাক্যগঠন করতেন গালের একটি পেশির সাহায্যে। তাঁর চশমায় বসানো একটি ইনফ্রারেড সুইচ তাঁর গালের নড়া চড়া ধরতে পারত। বাক্যগঠন সম্পূর্ণ হলে তা পাঠানো হত একটি স্পিচ সিনথেসাইজার-এ যার থেকে শ্রোতা শুনতে পেতেন স্টিফেন হকিং-এর বক্তব্য। তাঁর শরীর ক্রমশ যত অশক্ত হয়েছে, প্রকৃতির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য টেকনোলজির তত ক্রমমানোন্নয়ন (অর্থাৎ ক্রমাগত মানের উন্নতি) করতে হয়েছে।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে পিএইচডি ডিগ্রি শেষ করবার পর আমি ফেলো নির্বাচিত হলাম পার্শ্ববর্তী গনভিল অ্যান্ড কীজ (Gonville & Caius) কলেজে, যেখানে স্টিফেন হকিং প্রফেসরিয়াল ফেলো। এই সুবাদে চার বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁর সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ ও আলাপচারিতা। স্মৃতিনির্ভর খণ্ডচিত্রের কোলাজে এই আমার মহামানবের প্রতি বিনীত শ্রদ্ধার্ঘ।

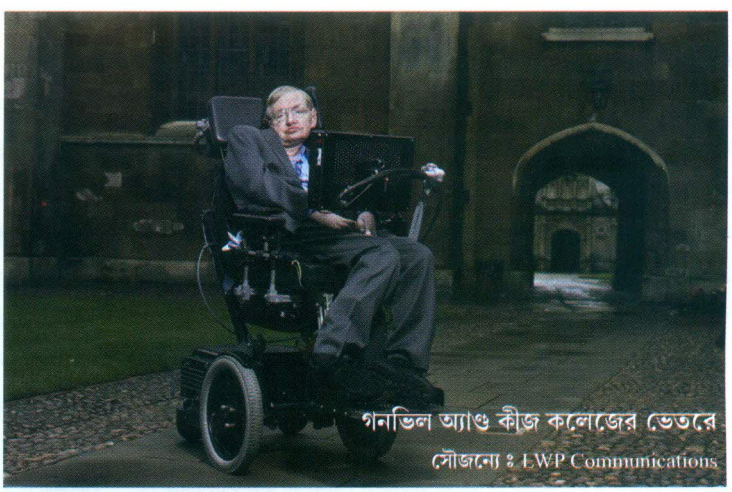

গনভিল অ্যাণ্ড কীজ কলেজের ভেতরে
সৌজন্যে ঃ LWP Communications

Caius কলেজের নামের বানানটি যেমন লিখেছি, কিন্তু উচ্চারণ ইংরেজি 'Keys' শব্দের মতন। এই কলেজের ইতিহাস খুব সমৃদ্ধ। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ মিলিয়ে সর্বকালীন নোবেল প্রাপকের নিরিখে এই কলেজের স্থান ট্রিনিটি কলেজের পরেই। কলেজটি অসাধারণ সুন্দর স্থাপত্য, ঘাসের লন ও উদ্যানের বৈশিষ্ট্যে। কলেজে তিনটি গেট বা তোরণদ্বার আছে। মূল প্রবেশদ্বারের নাম Gate of Humility অর্থাৎ বিনয়-দ্বার। মধ্যের তোরণটির নাম Gate of Virtue অর্থাৎ গুণ-দ্বার। আর Senate House-এর দিকে Gate of Honour অর্থাৎ সম্মান-দ্বার। গেটগুলির নামকরণে কি অনন্যসাধারণ দর্শন ও চিত্রকল্প! ছাত্রছাত্রীরা বিনয় নিয়ে কলেজে প্রবেশ করবে, কলেজে থাকাকালীন নানাবিধ গুণ অর্জন করবে এবং শিক্ষান্তে সম্মানের তোরণ দিয়ে নির্গত হয়ে সেনেট হাউস থেকে ডিগ্রি লাভ করবে। ভারতীয় শাস্ত্রেও আছে, 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম'- যার মনে শ্রদ্ধা আছে সে-ই জ্ঞান লাভ করে।

কলেজে ফেলোরা বিশেষ সম্মানিত। ট্রিনিটি, কীজ-এর মত ঐতিহ্যপূর্ণ কলেজগুলিতে ফেলোদের জন্য বিশেষ সম্মান ও অধিকার সংরক্ষিত আছে যা বর্হিজগতের কাছে হয়তো বিস্ময়কর লাগবে। যেমন ফেলোদের আছে ঘাসে হাঁটবার অধিকার। কলেজের অপূর্ব সুন্দর লনগুলোর ধারে ধারে নির্দেশিকা লাগানো আছে— 'অনুগ্রহ করে ঘাস থেকে দূরে থাকুন'। ছাত্রছাত্রী, কর্মী বা দর্শনার্থীদের ওই ঘাসের ওপর বসা, দাঁড়ানো বা হাঁটা বারণ। এই বিশেষ অধিকার আছে কেবল কলেজের নিজের ফেলোদের। তেমনই ফেলোরা ডিনার করেন High Table-এ যা বস্তুত অন্যদের খাবার টেবিলের থেকে খানিকটা উঁচুতে অবস্থিত। High Table টি লম্বাকৃতি, যার দুইধারে সারি দিয়ে চেয়ার পাতা। দুই প্রান্তে একটি একটি করে দুটি মাত্র চেয়ার। এর একটিতে বসেন কলেজের হেড যাকে মাস্টার বলা হয়, বা তিনি অনুপস্থিত থাকলে যিনি উপস্থিতদের মধ্যে 'সিনিয়র মোস্ট' ফেলো তিনি। এই চেয়ারে উপবিষ্ট ব্যক্তি ডিনারের নেতৃত্ব দেন বা প্রিসাইড করেন, এই হল ট্র্যাডিশন।

প্রথম যেদিন স্টিফেন হকিং আমায় চমকে দিলেন সেদিনের কথা বলি। High Table-এ ডিনার চলছে, আমার উল্টোদিকে স্টিফেন। কাঠের চেয়ারটিকে স্থানচ্যুত করে সেই পরিসরে বিরাজ করছে হুইলচেয়ারটি আর তাতে বসে আছেন মহামানব। ফেলোরা গাউন পরে খেতে আসেন, স্টিফেনের গায়েও গাউন। তার ওপরে বুকে বীব বেঁধে দিলেন নার্স এলেইন মেসন। তারপর স্টিফেনের শরীরটিকে ধরে সূক্ষ্ম ভঙ্গিমা বদল করলেন। এলেইন তাকালেন সামান্য প্রশ্নের ভঙ্গিতে, স্টিফেনের চোখে দেখলাম একটু ঔজ্জ্বল্য, ভাব বিনিময় হল। বুঝলাম খাবার পক্ষে উপযুক্ত অবস্থানগত সন্তোষ জন্মেছে বিজ্ঞানীর মনে। High Table-এ তিন কোর্সের ডিনার। নার্স খাইয়ে দিলেন স্টিফেনকে। মূল পর্ব শেষ হলে পাশের আর একটি ঘরে গিয়ে ডিনারের শেষ পর্ব— চীজ, ফল, কফি ইত্যাদি। এইপর্বে কয়েকজন ফেলোর সঙ্গে গল্প করছিলাম একটি দার্শনিক বিষয় নিয়ে— আমাদের ভাব প্রকাশের জন্য ন্যূনতম কতগুলি শব্দ প্রয়োজন। কেউ বলছিলেন কয়েকশো, কেউ বললেন আরও বেশি, কেউ বললেন এর উপর ভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রভাব। হঠাৎ একটি যান্ত্রিক কণ্ঠ বলে উঠল— "আমার কম্পিউটারের ডিকশনারিতে এত হাজার এতশ এতটি শব্দ আছে।" ঠিক সংখ্যাটি এখন আর মনে নেই, মনে আছে স্টিফেন হকিংও আড্ডা মন দিয়ে শোনেন এবং প্রয়োজন মতো আড্ডায় অংশগ্রহণ করেন এই বিস্ময়বোধ সেদিন কেমন শিহরিত করেছিল। আরও মুগ্ধ করেছিল তাঁর বক্তব্যের Precision।

একদিন ডিনারের এই শেষ পর্বে স্টিফেন ছিলেন সিনিয়রমোস্ট ফেলো। ফলে উনি টেবিলের প্রান্তের চেয়ারের জায়গায় হুইলচেয়ারে বসেছেন, Preside করছেন। কীজ কলেজে তখন একটি প্রথা ছিল। এই পর্বে কেউ ইচ্ছে করলে ধূমপান করতে পারতেন, বাটলার একটি রুপোর আধান খুলে ধরতেন, তার মধ্যে থাকত বিশেষ সিগার। সেদিন স্টিফেন নির্দেশ দিলেন, "আমি আজ ধূমপান করার অনুমতি দেব না"। গুঞ্জন উঠল ট্র্যাডিশন লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে। ধূমপায়ী দুএকজন বিরূপ মন্তব্য করলেন। কিন্তু স্টিফেন অবিচল রইলেন তাঁর সিদ্ধান্তে। তাঁর নির্দেশ দেবার অধিকার আছে, তিনি নির্দেশ দেবেন।

একদিন ডিনারের সময় অর্থনৈতিক ইতিহাসের শিক্ষক ইয়ান ম্যাকফারসন আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে স্টিফেন হকিংকে বললেন, "স্টিফেন, অভিজিৎ এখন সেই বাড়িটায় থাকে যেখানে তুমি আগে থাকতে"। কিছুক্ষণ পরে যান্ত্রিক কণ্ঠে স্টিফেন উত্তর দিলেন, "স্টিফেন হকিং এখনও ঐ বাড়িটির মালিক"। ইয়ান হাসতে হাসতে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্টিফেন, ঐ বাড়িটা তোমারই"। রসবোধ, অধিকার-সচেতনতা এবং নিখুঁত তথ্যের প্রতি আগ্রহ এই সংলাপে ধরা পড়েছে।

ওঁর বাড়িতে থাকার জন্যই হয়তো স্টিফেন আমার সম্বন্ধে একটু বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছেন কেমন লাগছে তাঁর বাড়ি। মৃদু হেসে বলেছি, খুব ভাল। উনিও একদিকে ঠোঁটটা একটু পাশাপাশি প্রসারিত করে মৃদু হেসেছেন। ওঁর হাসিটা এত মিষ্টি ছিল! গ্র্যাজুয়েট সেন্টারের পেছন দিকে একটি অপ্রশস্ত রাস্তার নাম Little St. Mary's Lane। এই রাস্তার ৬নং বাড়ি। রাস্তাটির শেষে ছিল একটি গির্জা, বাড়ির উল্টোদিকে কবরস্থান। তাই প্রথম প্রথম একটু অস্বস্তি হত। ক্রমে বাড়িটির প্রতিটি অংশ মহামানবের স্পর্শযুক্ত, এই বোধ প্রবল হল। স্টিফেন হকিং যেভাবে তামাম জনমানসকে আকর্ষিত করেছেন বিজ্ঞানীমহলে তাঁর তুল্য আর কেউ নেই। স্বভাবতই বাড়িটিও সকলের আগ্রহ ও কৌতূহল উদ্রেক করত। একদিন সকাল দশটা নাগাদ তিনতলার স্টাডিতে বসে কাজ করছি, হঠাৎ মনে হল Ground floor-এ যেন বহুলোকের কণ্ঠস্বর একসঙ্গে শোনা যাচ্ছে। সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে দেখি আমার বসবার ঘরে বহু পুরুষ ও মহিলা— কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ হাঁটাহাঁটি করছেন। কারোর হাতে মুভি ক্যামেরা। কেউ উজ্জ্বল আলো প্রক্ষেপণ করছেন। এত অচেনা লোক আমার ঘরে কেন? এর মধ্যে দেখি এক মহিলা সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা ওপরে উঠছেন, আবার বিশেষ কিছু একটা অনুধাবন করতে করতে ধীর পদক্ষেপে প্রতিটি ধাপ যেন মাপতে মাপতে নিচে নেমে আসছেন। সিঁড়ি বেয়ে ওঠা বা নামাই যে আসল উদ্দেশ্য নয় তা বোঝা যায়। এরকম কয়েকবার করবার পর আমি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কারা?" উনি পাল্টা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে?" অবাক হয়ে বললাম, "এটা আমার বাড়ি, এখানে আমি থাকি। এইতো আমি ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট সেরে তিনতলার স্টাডিতে বসে কাজ করছিলাম।" এতক্ষণে ব্রিটিশ ভদ্রমহিলাটি বুঝতে পেরে দুঃখপ্রকাশ করলেন এবং জানালেন যে তাঁরা হকিং-এর ওপর একটি শর্ট ফিল্ম নির্মাণ করতে চান, বাড়ির চাবি তাঁরা কলেজ থেকে সংগ্রহ করেছেন। মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি সিঁড়ি বেয়ে বারবার উঠে যাচ্ছেন, আবার নামছেন কেন? সম্ভবত ছোট ছায়াছবিটির পরিচালক তিনি। বললেন কোথাও পড়েছেন স্টিফেন হকিং ওই সিঁড়ি বেয়ে কতদূর উঠতে পারেন তা দিয়ে নির্ণয় করতেন ব্যাধির অগ্রগতি। মহিলাটি তাই নিজে ওঠানামা করে পঠিত প্রক্রিয়াটির একটি বাস্তব অনুভূতি অর্জনের চেষ্টা করছেন। বিজ্ঞান নিয়ে, বিজ্ঞানীর জীবন নিয়ে এমন প্যাশন আমাদের জীবদ্দশায় আর কোথায় দেখা গেছে?

৬, লিটল সেন্ট মেরিজ লেন

স্টিফেন হকিং-এর স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর ছিল। আমি আই.আই.টি খড়গপুরে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেবার আগে যোগাযোগ করলে উনি আমাকে যাবার আগে Caius কলেজের High Table-এ ওঁর অতিথি হিসেবে ডিনারের নিমন্ত্রণ করেন। স্পর্শ করে এ ঘটনা।

যাবতীয় শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করেছিলেন স্টিফেন হকিং। এত প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও তাদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য হকিং কখনও ঈশ্বরের শরণাপন্ন হননি। তিনি মনে করতেন মহাবিশ্বের সমস্ত রহস্য বিজ্ঞানই একদিন উন্মোচিত করতে সমর্থ হবে। তাঁর মতে, ভগবান নেই তা প্রমাণ না করা গেলেও তিনি তাঁর

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দ্বারা দেখিয়েছেন যে ভগবানের কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই।

হকিং খুব সুন্দর পাবলিক লেকচার দিতেন। আমি তাঁর বহু বক্তৃতা শুনেছি। প্রতিটিই উপস্থাপনার গুণে ছিল অনবদ্য। পাবলিক লেকচারগুলোকে সাধারণের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য গুরুগম্ভীর বিজ্ঞানের মাঝে তিনি গুঁজে দিতেন হিউমার ও লঘু মুহূর্তও। তাঁর রসবোধ ছিল তীক্ষ্ণ। তিনি এমনকি মৃত্যু সম্বন্ধেও রসিকতা করতে পেরেছেন। লিখেছেন, "গত ৪৯ বছর ধরে আমি বেঁচে আছি অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা নিয়ে। আমি মরতে ভয় পাইনা, তবে কিনা মরবার জন্য আমার কোনও তাড়াও নেই। তার আগে আমার এত কিছু করবার ইচ্ছে!"

স্টিফেন হকিং জন্মেছিলেন ১৯৪২ সালের ৮ জানুয়ারি। তাঁর জীবনের যে পরিচয় এই স্বল্প পরিসরে দেওয়া হল তাতে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের 'মৃত্যুঞ্জয়' কবিতার কয়েকটি পংক্তি যেন দিব্যি হকিং-এর মুখে মানিয়ে যায়। প্রতিবন্ধকতাকে উদ্দেশ্য করে হকিং যেন বলছেন—

"যত বড়ো হও
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।
আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো, এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চলে।"

২০১৮ সালের ১৪ মার্চ স্টিফেন হকিং চলে গেছেন। পৃথিবীর জন্য রেখে গেছেন মহাকাশস্পর্শী জ্ঞান, জীবনদর্শন ও অনুপ্রেরণা।

স্টিফেন হকিং-এর জীবন প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার প্রেরণা দেয়। বহুদিন ওঁর পাশে বসে দেখেছি কীভাবে একটি একটি শব্দ জড়ো করে একটি বাক্য তাঁকে বানাতে হয়। কখনও মনে হয়েছে হয়তো এই বাড়তি ঝামেলা তাঁকে যে কোনও ভাব সংক্ষেপে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। A Brief History of Time-এর প্রথম সংস্করণে স্টিফেন নিজে লিখেছিলেন, "বস্তুত, কণ্ঠস্বর হারাবার আগের থেকে আমি এখন বেশি ভালভাবে ভাব বিনিময় করতে পারি।" ট্র্যাকিয়োস্টোমি অপারেশনের সময় তাঁর গলা ফুটো করে নল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এতে তাঁর স্বরযন্ত্র নষ্ট হয়ে যায়, তিনি আর কথা বলতে পারেননি। এতবড় একটা ক্ষমতা হারানো নিয়ে বিলাপ না করে তিনি লিখেছেন এতে কী উপকার হল তার কথা। এমনকি মোটর নিউরোন রোগেও নাকি একটা সুবিধা হল! তিনি লিখলেন, "আমার শারীরিক অক্ষমতাগুলো আমার গবেষণাক্ষেত্রে, যা হল তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা, বিশেষ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং শারীরিক অক্ষমতাগুলো আমায় একরকম ভাবে সাহায্য করল আমাকে অন্যথায় যে পড়াতে ও প্রশাসনিক কাজ করতে হত তার থেকে বাঁচিয়ে।" প্রতিবন্ধকতাকে সুযোগে রূপান্তরিত করে দেখবার এ এক আশ্চর্য ও প্রেরণাময় কাহিনি। এই কাহিনির ক্ষুদে ও কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের জীবনেও যদি আসে প্রতিবন্ধকতা (যা সকলের জীবনেই আসে কিছু না কিছু পরিমাণে) তবে তারা স্টিফেন হকিং-এর জীবন থেকে প্রেরণা নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জীবনে অগ্রসর হবে এই আশা রাখি। স্টিফেন হকিং-এর একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক অবদান হল তিনি অঙ্ক কষে দেখিয়েছিলেন যে কৃষ্ণগহ্বর (Black Hole) থেকেও বিকিরণ নির্গত হয় যা হকিং রেডিয়েশন নামে খ্যাত। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই প্রবন্ধের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নানা ঘটনা ও বর্ণনার মাধ্যমে এটা অনুভব করা যে হকিং-এর জীবন আমাদের দেখায় 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো।'

ছবি সৌজন্য ঃ লেখক

গনভিল কোর্ট